যুগ-দার্শনিক রামেন্দ্রসুন্দর

ভবতোষ দত্ত

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর 'জিজ্ঞাসা' বইখানি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল ১৩১০ সালে। এই বইয়ের প্রবন্ধগুলি প্রায় সবই পূর্ববর্তী দশ বৎসরের মধ্যে লেখা। এই লেখাগুলির উপর নির্ভর করেই মূলত রামেন্দ্রসুন্দররের একটি সুজ্ঞাত পরিচয় গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞান ও দর্শনের দুরূহ বিষয় তিনি সহজ করে প্রকাশ করতে পারতেন। জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলি সম্পর্কে আজও আমাদের ধারণা এই যে, ঐগুলি বিজ্ঞান ও দর্শন সম্বন্ধীয় কতকগুলি বিচ্ছিন্ন আলোচনা মাত্র; নানা সময়ের সাধারণ বাঙালি পাঠকের সাধারণ জ্ঞানবৃদ্ধির উদ্দেশ্য মনে রেখেই বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রকাশের জন্য এগুলি রচিত হয়েছিল। প্রবন্ধগুলি সুরচিত এবং জ্ঞানগর্ভ— এ বিষয়ে কারো সন্দেহ নেই, কিন্তু এর পেছনে যে তদতিরিক্ত গভীরতর ধ্যান বা জীবনদর্শন আছে, সে কথা সম্ভবত বিশেষ কেউ ভেবে দেখেন নি। এ - বিষয়ে রামেন্দ্রসুন্দর নিজেই এই বইয়ের ভূমিকায় একটি গূঢ় ইঙ্গিত দিয়েছেন—

'সর্বদেশে ও সর্বকালে জ্ঞানীসমাজ যে সকল জাগতিক তথ্য নিরূপণের জন্য ব্যাকুল তন্মধ্যে কতিপয়ের অলোচনা এই গ্রন্থে স্থান পাইয়াছে। অধিকাংশ স্থলেই আলোচ্য বিষয় বিতণ্ডার ক্ষেত্র। বাদী - প্রতিবাদী উভয়পক্ষের মত - সংকলনে যথাজ্ঞান ও যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। মাসিক পত্রিকার প্রবন্ধে সংকীর্ণ আয়তনের মধ্যে ঐ সকল দুরূহ তত্ত্বের সম্যক আলোচনা সম্ভবপর নহে। গ্রন্থকারের এই প্রয়াস জিজ্ঞাসা মাত্র।

বিবিধ বিষয় আলোচিত হইলেও প্রবন্ধগুলির মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন সূত্র বাহির করা যাইতে পারে।'

জিজ্ঞাসার প্রবন্ধগুলি রচনার মূলে ছিল লেখকের গভীর জীবনজিজ্ঞাসা যা চিরকালের জ্ঞানীসমাজকে ব্যাকুল করেছে। বিচ্ছিন্ন হলেও এদের মধ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন ঐক্যসূত্র আছে। ঐ ঐক্যসূত্রই ব্যক্তি রামেন্দ্রসুন্দরের জীবনচিন্তা। সুতরাং জিজ্ঞাসা থেকেই রামেন্দ্রসুন্দরের গূঢ় জীবনভাবনাকে উদ্ধার করা যায়। জিজ্ঞাসা বিদ্যালয় - পাঠ্য প্রবন্ধগ্রন্থ মাত্র নয়। যথাযথভাবে অধ্যয়ন করলে দেখা যায় জিজ্ঞাসা আলোচিত বিষয় এবং অনুসন্ধিৎসার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগ্রত বাঙালি সমাজের চিন্তা - ভাবনার গভীর যোগ আছে। এই যোগটি অনুভব করবার সহজ উপায় হচ্ছে একালের আলোচিত প্রবন্ধনীতির সঙ্গে এর তুলনা। রামেন্দ্রসুন্দর যে সব বিষয়কে আলোচনার মধ্যে এনেছিলেন কিংবা যে সব জিজ্ঞাসার দ্বারা চালিত হয়েছিলেন, আজকালকার প্রবন্ধকারেরা তার দ্বারা প্রেরণা পান না। তাদের সন্ধানের বিষয় অন্য, রীতি ভিন্ন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় রামমোহনের আমল থেকে অক্ষয়কুমার - বঙ্কিমচন্দ্র - ভূদেব - বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাঙালি মনীষার যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে, 'জিজ্ঞাসা'র চিন্তা - বৈশিষ্ট্য তারই সঙ্গে তুলনীয়। জিজ্ঞাসার রচনাকাল ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশক। বহু কর্ম ও কীর্তিতেপূর্ণ, বিচিত্র ও অভিনব চিন্তাসম্পদে সমৃদ্ধ, বহু মনীষীর আবির্ভাবে সমুজ্জ্বল ঊনবিংশ শতাব্দী তখন অবসানের মুখে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর গ্রন্থে এই শতাব্দীর ভাবনাকে বিভিন্ন প্রবন্ধে সংহত করে দিয়ে গেলেন।

রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর বইখানার নাম দিয়েছেন 'জিজ্ঞাসা'। এই নামটি যেমন সুন্দর, তেমনই অর্থগভীর। এই নামকরণের সার্থকতা কোথায়— তার একটা ইঙ্গিত তিনি ভূমিকাতেই দিয়েছেন। এ-জিজ্ঞাসা সর্বদেশে সর্বকালের জ্ঞানীসমাজের জিজ্ঞাসা। সত্যকার জ্ঞানী - মাত্রই এই জিজ্ঞাসায় ব্যাকুল হন। দার্শনিকেরা চিরকাল সৃষ্টির মূল কারণ সন্ধান করে এসেছেন, বৈজ্ঞানিকেরা জানতে চেয়েছেন প্রকৃতির নিয়ম - পদ্ধতি। জ্ঞানী - মাত্রেরই এই প্রবৃত্তি। এই বইয়ের সংকলিত প্রবন্ধগুলির প্রকৃতি বিচার করলে সহজেই লক্ষ্যগোচর হয় রামেন্দ্রসুন্দরও সৃষ্টির সেই চিরকালের মৌলিক প্রশ্ন দ্বারাই চালিত হয়েছেন। সুখ না দুঃখ কোনটা সত্য, এ প্রশ্ন সভ্যতার প্রথম থেকেই মানুষের চিত্তকে আলোড়িত করেছে। নচিকেতা বা মৈত্রেয়ী, বুদ্ধ বা শংকর, এপিকিউরাস বা চার্বাকের চিন্তায় এবং বিভিন্ন যুগের কবিদের নানা কাব্যগাথায় নানাভাবে মানুষ এই জিজ্ঞাসাকে অপূর্ব করে প্রকাশ করে বলেছে। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর প্রবন্ধের উপসংহারে বলেছেন[১] —'মীমাংসা হইল না। নিরপেক্ষভাবে দুই দিক দেখাইতে গিয়া লেখক যদি অজ্ঞাতসারে কোন দিকে বেশী টান দিয়া থাকেন, পাঠকেরা মার্জনা করিবেন।'

ঠিক এই সুরেই অধিকাংশ প্রবন্ধ শেষ হয়েছে। 'জগতের অস্তিত্ব' প্রবন্ধটিও এমনি একই মৌলিক প্রশ্নের উত্তরের সন্ধানেই রচিত। কিন্তু উত্তর কি লেখক পেয়েছেন?

'এই এক এবং সদ্বস্তু, ইহার স্বরূপ কি? ইহা সৎ, ইহা অস্তি, ইহা সত্য পদার্থ— তথাস্তু। ইহা চিৎ, ইহা চিন্ময় পদার্থ— mind - stuff —তথাস্ত। ইহা আনন্দস্বরূপ— তাই কি? কেহ কেহ ভ্রূকুটি করিবেন, ইহা সৎ নহে, অসৎও নবে, সৎও বটে অসৎও বটে তাহাও নহে, সৎও নয় অসৎও নয় তাহাও নয়। উহার পারিভাষিক নাম শূন্য। হিউম ও হক্সলী হয়ত বলিবেন, সদ্বস্তুর জন্য এত মাথাব্যথা কেন? যাহা আছে, তাহাই আছে। মায়াপটের অন্তরালে যাইবার আবশ্যকতা কি? চিদ্বস্তু, সন্দেহে নাই? কিন্তু চিদ্বস্তুর মূলে কি আছে, অন্বেষণের প্রয়োজন নাই। সদ্বস্তুর মরীচিকায় প্রতারিত হইও না।[২]

'সৃষ্টি', 'সৌন্দর্যতত্ত্ব', 'কে বড়', 'অমঙ্গলের উৎপত্তি', 'যুক্তি', 'মায়াপুরী' প্রভৃতি প্রায় সব প্রবন্ধেই রামেন্দ্রসুন্দর চিরন্তন সমস্যা এবং প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করেছেন। নানাভাবে বিভিন্ন দিক থেকে বিভিন্ন মনীষীর চিন্তার আলো ফেলে প্রশ্নের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করেছেন। কখনও মনে হয় উত্তর বুঝি এসে গেল, কিন্তু পরক্ষণেই নতুন দিক থেকে তার জটিলতা দেখিয়ে দেন। এইভাবেই তিনি পাঠকের বিচারশক্তিকে এবং উত্তরের জন্য ব্যাকুলতাকে তীব্রতর করে তোলেন। অতি সাধারণ বিশ্বাস এবং সংস্কারকেও তিনি প্রশ্ন করেছেন, তার অনিশ্চয়তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সর্বত্রই তাঁর প্রবন্ধ পর্যবসিত হয় কোনো উত্তরে নয়, বিশুদ্ধ অনুসন্ধিৎসাতে। সমস্যাকে নানাদিক থেকে দেখাতে তাঁর আনন্দ। সেইজন্য বারবার উত্তর - সন্ধানে ব্যর্থ হয়েও তিনি বিরত হন না। তিনি বলেন—[৩]

'আশ্চর্য এই যে, কি জানি কি খেয়ালের বশ হইয়া আমি যেন তাহা জানি না, এইরূপ অভিনয় করি এবং আমার বাহিরে এবং আমার উপরে আর একজন কল্পনাকর্তার ও রচনাকর্তার কল্পনা করিয়া, কোথায় তিনি, কোথায় তিনি এইরূপ জিজ্ঞাসার পণ্ডশ্রমে আমি প্রস্তুত হই। অথবা স্বতন্ত্র আমার, স্বাধীন আমার, মুক্ত আমার, এইরূপ পরতন্ত্রবৎ, বদ্ধবৎ আচরণেই, —এই পণ্ডশ্রম স্বীকারেই আমার আহলাদ এবং এই জিজ্ঞাসাতেই আমার আনন্দ।'

এই জিজ্ঞাসা চিরকালেই জ্ঞানিসমাজে থাকলেও এ যুগে এর একটা ভিন্নতর বৈশিষ্ট্য ও মহিমা আছে। একালে জিজ্ঞাসা কেবল দার্শনিক বা ঈশ্বর সন্ধানীর তত্ত্বচিন্তায় সীমাবদ্ধ নেই। জিজ্ঞাসা এখন আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক জগতের সর্বস্তরেই পরিব্যাপ্ত। প্রাচীনযুগে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং ইহলৌকিক প্রয়োজন - সাধনের জটিলতা এত বেশি ছিল না। বাস্তব বা প্রাকৃতিক জীবন এবং আধ্যাত্মিক জীবন ছিল সম্পূর্ণ পৃথক। মানুষের উচ্চতর চিন্তা সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক জগতেই বিচরণ করে ফিরেছে। আমাদের দেশের

তো কথাই নেই। ভারতবর্ষের দার্শনিক ধ্যান ও বিচার আত্মা ঈশ্বর জগৎ ইত্যাদি সম্বন্ধে যে অপরিসীম এবং অক্লান্ত আগ্রহ দেখিয়েছে, এই ভৌতিক জগৎ সম্বন্ধে তার কিছুই দেখায় নি। এ যেন একটা সম্পূর্ণ পৃথক অভিজ্ঞতার জগৎ, যে - অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে জ্ঞানীরা চিরকালই সন্দিহান। অদ্বৈত - বৈদান্তিক তো একে বলেছেন মায়া আর দ্বৈতবাদী ভক্ত একে বলেছেন 'অপ্রাকৃত লীলা'। সুতরাং এই লৌকিক জগৎ সম্বন্ধে কোনো কৌতূহলই তাঁদের ছিল না। আমাদের দেশে এই জগৎ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা যাঁর মধ্যে প্রথম জেগেছিল তিনি বলেছিলেন—[৪]

'পূর্বে আমারদিগের দেশে এত দর্শনশাস্ত্র প্রকাশ হইয়াছে, এ বিষয়ের অনুসন্ধান করা তাহার তাৎপর্য ছিল না। আপনারদিগের শারীরিক ও মানসিক স্বভাব ও বাহ্যবস্তুর সহিত তাহার সম্বন্ধ বিবেচনা করিবার প্রয়োজন তৎকালিন লোকের সম্যক বোধগম্য হয় নাই।'

তবু মনে হয় প্রাচীনযুগে ভারতীয় দর্শনচিন্তার যে প্রসার ঘটেছিল, সেও ছিল সত্যকার জিজ্ঞাসা। সে চিন্তা শুধু অর্থহীন পুনরুক্তি মাত্র নয়। কিন্তু পরবর্তীকালে, যাকে আমরা মধ্যযুগ বলি, সেকালে এই জিজ্ঞাসা আর ছিল কিনা সন্দেহ। বাংলা দেশে মধ্যযুগে মননের প্রধান ফল নব্যন্যায়। নব্যন্যায়ের সূক্ষ্ম বিচার - বিশ্লেষণের তুলনা সুলভ্য নয়, কিন্তু এর ভিত্তি কি? প্রাচীন ভারতবর্ষে যেমন ইহলৌকিক জীবন সম্বন্ধে কোনোরকম কৌতূহলকেই অনাবশ্যক প্রমাণিত হয়েছিল, মধ্যযুগেও তেমনি ইহজীবনটাকে ধর্তব্যের মধ্যেই আনা হয় নি। মধ্যযুগে পণ্ডিতেরা বাস করে গিয়েছেন এক বিচিত্র শব্দের জগতে, সেখানে শব্দ নিয়ে বিচার, অতি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে যুক্তি বিস্তার— প্রাকৃতিক জগতের বাস্তবতা থেকে তা সুদূরপরাহত। বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছিলেন—[৫]

It is, indeed, still taught wiht reverence, and learnt with awe, in the secluded tols of Nadiya and other seats of ancient learning, but the philosophy of the tols is the most barren and uprofitable study in which the human intellect can engage itself. Philosophy as taught by the pandits, is simply a storehouse of verbal quibbles as thught by the pandits, and high proficiency in it is considered synonymous with high proficiency in the art of proficiency in the art of profitless wrangling. The sum of useful human knowledge would in no way be diminished if by some fortunate accident, the philosophy of the tols disappered from the face of the earth.

বঙ্গিমচন্দ্র খুব কঠিন কথা বলে গিয়েছেন। কিন্তু সত্যই যদি সন্ধান করি মধ্যযুগে বাঙালি মনীষার জিজ্ঞাসা ব্যাপৃত ছিল কি নিয়ে তবে শেষপর্যন্ত বঙ্কিমের কঠিন মন্তব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। য়ুরোপে এই ধরনের যুক্তি বিচারকে বলা হত স্কলাসটিসিজম্।

একদিকে দার্শনিক চিন্তা পরিণত হল নেহাতই বুদ্ধির ব্যায়ামে আর একদিকে বাস্তব - জীবন এবং প্রাকৃতিক জগৎ আমাদের সবরকম মনন ও চিন্তার বাইরেই থেকে গেল। এর গতিপ্রকৃতি এর সঙ্গে মানুষের সংযোগ ও ব্যবহার, বৃহত্তর সমাজজীবনের প্রতি ব্যক্তি মানুষের কর্তব্যপালন— এসব বিষয়ে কোনো কৌতূহল বা জিজ্ঞাসাই আর থাকল না। আমাদের নীতিনিয়ম ধর্মাচরণ লোক - ব্যবহার কল্যাণভাবনা এসবই পর্যবসিত হল শাস্ত্রগত নির্দেশে, অন্ধ আনুষ্ঠানিকতায়। পণ্ডিতের জিজ্ঞাসা আমাদের বাস্তবজীবনকে অবলম্বন করে নি কিংবা প্রকৃতির বিধানকেও বিশ্লেষণ করে দেখে নি।

এই জিজ্ঞাসা প্রথম দেখা দিল রামমোহনের মধ্যে। যে - অভ্যাসকে আমরা এতকাল পালন করে এসেছি, তার সার্থকতা নিয়ে তিনিই প্রথম প্রশ্ন করলেন। আমাদের দীর্ঘকাল - প্রচলিত আচার - অনুষ্ঠানগুলিকে নতুন করে বিচার করে এর সার্থকতা জানাবার ইচ্ছা জেগে উঠল। কেমন করে তাঁর মনে এই প্রশ্ন এসেছিল, সে - প্রসঙ্গ ভিন্ন। কিন্তু এ কথা সত্য যে তিনি উৎসুক হলেন। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে রামমোহনের এই জিজ্ঞাসা পুরোপুরি আধুনিক রূপ গ্রহণ করে নি। তিনি শাস্ত্র দিয়েই আচারের ব্যাখ্যা খুঁজেছেন। প্রাচীন স্মার্ত পণ্ডিতের মতো শাস্ত্রের নতুন অর্থ নির্ণয় করেছেন। তাঁর প্রণালীও পণ্ডিতী বা স্কলাসটিক। শাস্ত্র - পুরাণের বাইরে বিশ্বনীতি বা বিশ্বপ্রকৃতির নিয়মকে স্বতন্ত্রভাবে অবলম্বন করে আচার - অনুষ্ঠানকে তিনি বিচার করে দেখেন নি। কিন্তু তিনি যে অন্ধ জড় অভ্যাসকে মানতে চাইলেন না, এতেই বোঝা যায় তাঁর মনে এ বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। এই সংশয় আধুনিক মনের প্রবৃত্তি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালির যে নবজাগরণ ঘটেছিল, তার প্রধান লক্ষণ ছিল এই সংশয় এবং জিজ্ঞাসা।

পাশ্চাত্য জাতির সংস্পর্শে এসে বাঙালির মনে বিশ্বজগৎ সম্বন্ধে যে কৌতূহল জেগে উঠতে আরম্ভ হয়েছিল তার প্রাথমিক পরিচয় পাওয়া যায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বিচিত্র বিষয়ের পাঠ্যগ্রন্থ রচনায়, বিশ্বের ইতিহাস - সন্ধানে, ভূগোল, ইতিহাস, পদার্থতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা ইত্যাদি নানা বিষয়ে বাঙালির ঔৎসুক্যকে জাগিয়ে তোলার চেষ্টায়। বলা বাহুল্য ঐগুলি নেহাতই বালকপাঠ্য। তথাপি মনে রাখা দরকার, প্রাকৃতিক বা আধিভৌতিক বিষয়ে আমাদের যে জ্ঞানস্পৃহা জেগে উঠছে, এটা নিশ্চয়ই যুগান্তরের লক্ষণ। নব্যবঙ্গের দল ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে য়ুরোপীয় সভ্যতার জীবন ও সমাজ - জিজ্ঞাসার সঙ্গে গভীরতর পরিচয় লাভ করেছে।[৬] এই জিজ্ঞাসাই ক্রমে গভীর ও জটিল নৈতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত হল। সমাজ ও জীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, নির্বিচার শাস্ত্রপালনের যৌক্তিকতা, প্রাকৃতিক জগতের অনুশাসনের দ্বারা ব্যক্তির কর্তব্য নির্ণয়— এই সব গভীরতর প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসাই ক্রমে গভীর ও জটিল নৈতিক প্রশ্নে রূপান্তরিত হল। সমাজ ও জীবনের বৈশিষ্ট্য নির্ণয়, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, নির্বিচার শাস্ত্রপালনের যৌক্তিকতা, প্রকৃতি জগতের অনুশাসনের দ্বারা ব্যক্তির কর্তব্য নির্ণয়, ব্যক্তির সঙ্গে সমাজের সম্পর্ক, নির্বিচার শাস্ত্রপালনের যৌক্তিকতা, প্রাকৃতিক জগতের অনুশাসনের দ্বারা ব্যক্তির কর্তব্য নির্ণয়— এই সব গভীরতর প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার দিকে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তা উন্মুখ হয়ে উঠল। অক্ষয়কুমার দত্তের রচনাকে বাঙালি মানসের এই প্রবণতার প্রথম প্রতীক বলে নির্দেশ করা যায়। অক্ষয়কুমার ভূগোল পদার্থতত্ত্ব চারুপাঠ প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন সাধারণ পাটকদের মধ্যে জ্ঞানের বিস্তারের জন্য, আবার এই বিচ্ছিন্ন জ্ঞানচর্চাই সংহত রূপ নিয়েছিল 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' (১৮৫২) গ্রন্থে। এই গ্রন্থে সুসম্বন্ধ তত্ত্বচিন্তা সত্যকার আধুনিক জিজ্ঞাসায় এবং তার উত্তর - সন্ধানে পরিণত হয়েছে। আধুনিক মানুষ এখন ঈশ্বর বা আত্মার চিন্তায় মগ্ন নয়, এখন সে জানতে চায় এই বাহ্যজগতের সঙ্গে মানুষের সম্বন্ধ কি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে যুগের জিজ্ঞাসা চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে। অক্ষয়কুমার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন,[৭]

'আমি খুঁজিতেছি ঈশ্বরের সহিত আমার কি সম্বন্ধ আর তিনি খুঁজিতেছেন বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধ।'

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নানা কর্মে নানা উদ্যমে এই একই প্রশ্ন প্রচ্ছন্ন — বিশ্বজগতে মানুষের স্থান কোথায়, বিশ্বনীতি এবং ব্যক্তিনীতির সম্পর্ক কি। এই জিজ্ঞাসা শুধু তত্ত্বচিন্তায় নয়, অন্য সাহিত্যেও দেখা দিয়েছে। মধুসূদনের রাবণ একটি খাঁটি ঊনিশ শতকীয় চরিত্র। রাবণ যখন এই ব্যাকুল প্রশ্ন করে—

'কি পাপে লিখিলা
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে?'[৮]

তখন এই প্রশ্ন আপাতদৃষ্টিতে অর্থহীন মনে হয়। রাবণ যে কি পার করেছে সে কি কারো অজানা? কিন্তু পাপ করলে তার যে প্রতিফল হয়, এই শাস্ত্রনির্দিষ্ট কার্যকারণবোধ নিয়ে পরিতৃপ্ত তুষ্ট থাকবার যুগ আর নেই। প্রত্যক্ষ প্রাকৃতিক নিয়মের কার্যকারণ নিয়ে এই পরিণামকে নির্দেশ করা যায় না বলেই রাবণের বিস্ময়। প্রকৃতির কোন নিয়মে এমন অসম্ভব কাণ্ড ঘটতে পারে—

হায়, বিধি বাম মম প্রতি
কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে,
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বাঁচে?[৯]

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই জিজ্ঞাসার দুটি দিক আছে। একটিই হচ্ছে প্রাকৃতিক জগৎ নিয়ে। প্রকৃতিতে যে সব ঘটনা ঘটে, জন্ম মৃত্যু রোগ শোক দিন রাত্রি বন্যা মারী প্রভৃতি— এ সব কেন ঘটে, পূর্বতন যুগে এ সব ঘটনার ব্যাখ্যা এক রকম ছিল, আধুনিককালে মানুষ সে ব্যাখ্যায় সন্তুষ্ট নয়। রামেন্দ্রসুন্দর 'অমঙ্গলের উৎপত্তি' প্রবন্ধে ঈশ্বর শয়তান কর্মফল জেহোবা প্রভৃতি প্রাচীন ব্যাখ্যার অবতারণা করেও তৃপ্ত হতে পারেন নি। এখানেও তিনি কোনো মীমাংসায় পৌঁছুতে পারেন নি বিশুদ্ধ জিজ্ঞাসাই থেকে গিয়েছে। এই সব প্রাকৃতিক ঘটনার প্রাচীন ব্যাখ্যায় সত্যই আর আধুনিক মানুষের মন ভরে না।

A general demand for restatement or explanation seems to have arisen from time to time. Such a demand presumably indicates a disharmony between traditional explanation and current needs. It does not necessarily imply the 'falsehood' of the older statement; it may merely mean that men now wish to live and to act according to different formula... Interest was now directed to the new, the manner of causation, not its way, its final cause.[১০]

এই নতুন ব্যাখার একটি সুন্দর উদাহরণ আছে বঙ্কিমচন্দ্রের 'ধর্মতত্ত্বে'—[১১]

'শিষ্য। আপনি কি বলেন যে এই দারিদ্র্য, গৃহদাহ, রোগ এ সকলই অধর্মের ফল?

গুরু। তা বলি।

শিষ্য। পূর্বজন্মের?

গুরু। পূর্বজন্মের কথায় কাজ কি? ইহজন্মের অধর্মের ফল।

শিষ্য । আপনি কি ইহাও জানেন যে এ জন্মে আমি অধর্ম করিয়াছি বলিয়া আমার রোগ হয়?

গুরু। আমিও মানি, তুমিও মান। তুমি কি মান না যে হিম লাগাইলে সর্দি হয়, কি গুরুভোজন করিলে অজীর্ণ হয়?'

এই ব্যাখ্যা বৈজ্ঞানিক রীতির ব্যাখ্যা, প্রত্যক্ষ জগতের কার্যকারণসূত্র নির্ণয়। পূর্বে এই সব ঘটনার কারণ হিসাবে হয়তো উল্লিখিত হয় মানুষের পাপ পূণ্য ইহাদির। কিন্তু আধুনিক যুগে প্রাকৃতিক নিয়মের প্রত্যক্ষ সাক্ষ্য ছাড়া কোনো কিছুর ব্যাখ্যা চলে না। এই নতুন রীতির ব্যাখ্যার সন্ধানই নতুন যুগের জিজ্ঞাসা।

আধুনিক জিজ্ঞাসার এটা হল একটা দিক— প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যাখ্যা সন্ধান। এটা বহির্জগতের। এর আর একটি দিক আছে— অন্তর্জগতের বা নৈতিক জগতের। মানুষের কর্তব্য কি, আচরণবিধি কেমন হওয়া উচিত, লোককল্যাণ এবং চরিত্রনীতির স্বরূপ কি? পূর্বে এ সম্বন্ধে সাধারণত কোনো জিজ্ঞাসা ছিল না। শাস্ত্রনির্দেশই ছিল শেষ কথা। স্মৃতিসংহিতার বিধানই ছিল প্রামাণ্য। দেশাচার শাস্ত্রাচার এবং সহস্রবিধ অভ্যাস ও অনুষ্ঠানে আমাদের জীবনযাত্রা ছিল প্রামাণ্য। দেশাচার শাস্ত্রাচার এবং সহস্রবিধ অভ্যাস ও অনুষ্ঠানে আমাদের জীবনযাত্রা ছিল সমাচ্ছন্ন। রামমোহন বিদ্যাসাগর এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করলেন, কিন্তু 'হৃদয়েনাভ্যনুজ্ঞাতঃ।' নৈতিক তত্ত্বচিন্তা করেছিলেন অক্ষয়কুমার এবং বঙ্কিমচন্দ্র। তাঁরা মানুষের কর্তব্য সম্বন্ধে গভীর বিচার করলেন। অক্ষয়কুমারের সে চেষ্টার পর বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন অনুশীলনতত্ত্ব বা মানুষের ধর্মনীতি।

প্রাচীন নৈতিক ব্যাখ্যার ও আধুনিক নৈতিক ব্যাখ্যার প্রধান পার্থক্য এই যে - একালে নৈতিক আচরণকে প্রাকৃতিক নিয়মের অমোঘ ও প্রত্যক্ষ পরিণামের উপরেই স্থাপন করা হয়েছে। শাস্ত্রের অন্ধ আনুগত্যের জন্য নয়, বৈজ্ঞানিক এবং ব্যবহারিক জগতের ক্রিয়া - প্রতিক্রিয়া বিবেচনা করেই নৈতিক বিধি নির্ধারিত। ইউটিলিটারিয়ানিজম্ এবং পজিটিভিজম বাঙালির নবজাগ্রত মননবৃত্তিকে এমনি করেই প্রভাবিত করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলনতত্ত্বে যে নতুন নীতিশাস্ত্র রচনা করেছিলেন, তারও মূলে ছিল মানুষের কর্তব্য - নির্ণয় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা। এর বিবরণ তিনি দিয়েছেন।[১২]

''অতি তরুণ অবস্থা হইতেই আমার মনে এই প্রশ্ন উদিত হইত, 'এ জীবন লইয়া কি করিব?' লইয়া কি করিতে হয়?' সমস্ত জীবন ইহার উত্তর খুঁজিয়াছি। উত্তর খুঁজিতে খুঁজিতে জীবন প্রায় কাটিয়া গিয়াছে, অনেক প্রকার লোকপ্রচলিত উত্তর পাইয়াছি, তাহার সত্যাসত্য নিরুপণ জন্য অনেক ভোগ ভুগিয়াছি, অনেক কষ্ট পাইয়াছি। যথাসাধ্য পড়িয়াছি, অনেক লিখিয়াছি, অনেক লোকের সঙ্গে কথোপকথন করিয়াছি এবং কার্যক্ষেত্রে মিলিত হইয়াছি। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস দর্শন দেশী বিদেশী শাস্ত্র যথাসাধ্য অধ্যয়ন করিয়াছি। জীবনের সার্থকতা সম্পাদন জন্য প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছি।''

ঊনবিংশ শতাব্দীর শিক্ষিত বাঙালি চেতনার জিজ্ঞাসার যে দুটি দিক দেখা গিয়েছিল, রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসা বইখানি প্রধানত প্রথমটিরই অভিব্যক্তি। সেকালের মননপ্রণালীর বিশিষ্টতায় নৈতিক জিজ্ঞাসা ছিল বস্তুজিজ্ঞাসা - সাপেক্ষ। আগেই বলেছি, প্রাকৃতিক নিয়মের সূত্র দিয়েই নীতিনির্ধারণের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। রামেন্দ্রসুন্দর তাঁর এই বইটিতে কর্তব্যনীতির আলোচনা করেন নি যদিও অনিবার্যভাবেই সে - প্রসঙ্গ কখনও কখনও এসে গিয়েছে। বস্তুবিশ্লেষণই তিনি আনন্দ পেয়েছেন, সিদ্ধান্ত অনেক সময়েই অলব্ধ, ফলে চরিত্রনীতির মানদণ্ডও অধিকতর দুর্লভ। কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসা শেষ পর্যন্ত কেবল বস্তুজগতেই বদ্ধ থাকেনি; তাঁর জিজ্ঞাসা বিস্তৃত হয়েছে অন্তর্জগতে নীতির সূত্রে উদ্‌ভাবনে। তাঁর সেই অনুসন্ধিৎসার ফল 'কর্মকথা'র আশ্চর্য প্রবন্ধগুলি।

'জিজ্ঞাসা'য় রামেন্দ্রসুন্দরের বস্তুবিচারের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি এখানে সাধারণভাবে ব্যবহারিক জগতের বর্ণনা করে যান নি। অক্ষয়কুমার দত্ত পদার্থবিদ্যা বা ভূগোলের যে বই লিখেছিলেন তাতে তিনি সাধারণ জ্ঞান বিতরণ করেছিলেন মাত্র। রামেন্দ্রসুন্দরের আলোচনা বর্ণনামূলক আলোচনা মাত্র নয়। তিনি এই প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাধারার নিয়ামক কোনো নিয়ম আবিষ্কার করতে চেয়েছেন। দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায়, সৌন্দর্যকে নানাভাবে নানা পর্যায়ে অনুভব করা হয়। এর কোনো সাধারণ নিয়ম আছে কি? বস্তুজগতের অস্তিত্ব কি সকলে একইভাবে অনুভব করে? মঙ্গল ও অমঙ্গল বলতে আমরা যা বুঝি তার কি কোনো নিরপেক্ষ সংজ্ঞা আছে? মুক্তি বলতে বিভিন্ন নীতিশাস্ত্র যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছে তাদের মধ্যে কোনো ঐক্য সম্ভব কি? অতিপ্রাকৃত বলতে কি বোঝায়? প্রাকৃতিকনিয়মের অতীত কোনো অতিপ্রাকৃত কি সম্ভব? সুখ ও দুঃখের সংজ্ঞা কি? এদের কি বস্তুগত অস্তিত্ব আছে? তার ব্যাখ্যা কি? সত্যকে তো পনটিয়াস পাইলেট ঠাট্টা করেই উড়িয়ে দিয়েছিল। তবে সত্যের সংজ্ঞা কি?

এই ধরনের প্রশ্ন ও বিচারকে আমরা সহজেই দার্শনিক বলে নির্দেশ করতে পারি। কিন্তু এই আলোচনার সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য এই যে রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানের প্রাপ্ত সিদ্ধান্তগুলিকেই একটি একটি করে সংগ্রহ করে বিন্যস্ত করে শ্রেণীবদ্ধ এবং পারস্পরিক সংযোগ লক্ষ্য করে এদের অন্তর্নিহিত ঐক্যসূত্র বা নিয়ম বের করবার চেষ্টা করে দেখেছেন। নিয়ম - নির্ধারণ বিজ্ঞানেরই কাজ, কিন্তু সে - নিয়মগুলি এক এক বিভাগের নিজের নিয়ম। এই নিয়মেরও নিয়ম থাকা সম্ভব অর্থাৎ রামেন্দ্রসুন্দরের জিজ্ঞাসা ছিল সর্বব্যাপী নিয়মে। এ ধরনের প্রয়াস মূলত দার্শনিকের কিন্তু দার্শনিক জিজ্ঞাসায় বস্তুবিজ্ঞানকে এমন করে ভিত্তি আমাদের দেশে প্রাচীনকালে কখনই করা হয় নি। আগেই বলেছি, বস্তুজগৎকে চিরকালই সন্দেহের চোখে দেখা হয়েছে বলেই এর সাক্ষ্যপ্রমাণকে অন্তর্ভুক্ত করার কথাই ওঠে নি।

মননের এই পদ্ধতি আধুনিক। য়ুরোপেও রেনেসাঁসের পর এই পদ্ধতিই প্রচলিত হয়েছে। এর প্রবর্তকের নাম ফ্র্যান্সিস বেকন। বস্তুবিজ্ঞানের সব বিভাগের থেকে জ্ঞান আহরণ করে বেকন চেষ্টা করেছিলেন অন্তর্নিহিত নিয়মসূত্রটিকে আবিষ্কার করতে। এমন কি জ্যোতিষ, স্বপ্ন, ভোজবাজি কোনোটাকেই বেকন বাদ দিতে চান নি। বলা যায় না কোনটার থেকে কোন অভাবিত কার্যকারণসূত্র আবিষ্কৃত হবে—

Nothing is beneath Science, nor above it, Sorceries, dremas, predictions, telepathic communications, “psychical phenomena” in general must be subjected to scientifec examination; “for it is not known in what cases and how for, effects attributed to superstition participate of natural causes,”. Despite his strong naturalistic bent he feels the fascination of these problems; nothing human is alien to him.[১৩]

রামেন্দ্রসুন্দরের জ্ঞানের পিপাসা ছিল বেকনের মতোই। জ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে তিনি বিচরণ করে ফিরেছেন। পদার্থ বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত, রসায়নের তথ্য, জীববিজ্ঞানের আবিষ্কার, বৌদ্ধ দর্শন এবং বেদান্তের অভিমতের সঙ্গে ফলিত জ্যোতিষ, খ্রীষ্টীয় পুরাণ, হিন্দুর নৈতিক সংস্কার— সব কিছুরই খবর তিনি রাখতেন এবং নিয়মতত্ত্বের অনুসন্ধানে সব কিছুই বিচার করে দেখেছেন। ঠিক বেকনের মতোই রামেন্দ্রসুন্দর বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে বৃহত্তর নিয়মের সন্ধান করেছেন—

So Bacon runs from field to field, pouring the seed of his thought into every Science. At the end of his survey he comes to the conclusion that science by itself is not enough; there must be a force and discipline outside the science to co-ordinate them and point them to a goal. He condemns the habits of looking at isolated facts out of their context without considering the unity of nature.[১৪;]

মধ্যযুগীয় রহস্যবোধ সংস্কার অলৌকিক যুক্তিহীন বিশ্বাসের স্থানে যুক্তিবোধ্য নিয়মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আধুনিকতার সর্বপ্রধান লক্ষণ। বেকনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির পরিণামে নিয়মতন্ত্রের প্রতি গভীর আস্থা পরবর্তী শতাব্দীর চিন্তাধারাকে শাসন করে এসেছে। এই নিয়ম - নিষ্ঠা শেষ পর্যন্ত যদিও একটা যান্ত্রিক অভ্যাসের মতোই হয়ে দাঁড়িয়েছিল, তথাপি এর ফলে চিন্তার যে পরিচ্ছন্নতা এবং বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি লাভ করা গিয়েছে তার মূল্য কম নয়। পজিটিভিজ্‌ম হচ্ছে প্রত্যক্ষ জীবনচিন্তা আর ইউটিলিটরিয়ানিজ্‌ম হচ্ছে নীতিবোধের যুক্তিবন্ধ মানদণ্ড। বাংলাদেশের আধুনিক যুগের আরম্ভ থেকেই রহস্যবর্জিত প্রকৃতির একান্ত অনুগত্য এবং তারই স্বাভাবিক পরিণতি হিসাবে প্রত্যক্ষতাবাদ এবং উপযোগিতাবাদকে গ্রহণ আমাদের আধুনিক ভাবনার অচ্ছেদ্য প্রমাণ। মিসটিসিজ্‌মকে বর্জন করে বিশ্বজগৎকে নিয়মশাসিত করে দেখতে গিয়ে ‘প্রাকৃতিক নিয়ম’— তত্ত্বের উদ্‌ভব।[১৫] ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে ও মননে প্রাকৃতিক নিয়মের আধিপত্য বিশেষ করেই লক্ষ্য করবার বিষয়।

রামেন্দ্রসুন্দর ‘জিজ্ঞাসা’য় পূর্বসংস্কারমুক্ত হলেও এই সংস্কার তাঁর ছিল— যদি এই নিয়মপ্রীতিকে সংস্কার বলা যায়। ‘নিয়মের রাজত্ব নামক সুপরিচিত প্রবন্ধটিতে তিনি তাঁর এই বিশ্বাসকেই বুঝিয়ে বলেছেন যদিও লঘুভঙ্গিতে। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইতিহাস - ব্যাখ্যায় সমাজ- ব্যাখ্যায়, সাহিত্য - ব্যাখায়, ধর্ম - ব্যাখ্যায় প্রাকৃতিক নিয়ম - তত্ত্বের যে অপ্রতিহত প্রভাব পড়েছিল,[১৬] তার চূড়ান্ত রূপ হচ্ছে এই প্রবন্ধটি। তাঁর পরিহাস পূর্ণ বক্তব্য - ভঙ্গিতেই বোঝা যায় এতে মানুষের চিরকালীন জ্ঞানের সীমা নির্দিষ্ট হয়েছে কিনা তাতে বোধ হয় তাঁর সংশয় আছে—[১৭]

‘‘যাহা দেখিব, তাহাই প্রাকৃতিক নিয়ম। যাহা এ পর্যন্ত দেখি নাই, তাহা নিয়ম নহে বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারি; কিন্তু যে কোন সময়ে একটা অজ্ঞাতপূর্ব ঘটনা ঘটিয়া আমার নির্ধারিত প্রাকৃতিক নিয়মকে বিপর্যস্ত করিয়া দিতে পারে। কাজেই এটা প্রাকৃতিক নিয়ম, ওটা নিয়ম নহে, ইহা পুরা সাহসে বলাই দায়’’

কিন্তু ব্যবহারিক জগতে প্রাকৃতিক নিয়মের চেয়ে সত্য আর কিছু নেই। তিনি বলেন,[১৮]

‘‘বাহ্যজগৎকে দেশে সাজাই ও কালে সাজাই; এবং উভয়ের মধ্যে উক্তরূপ সুবিহিত ব্যবস্থা রাখিয়া সাজাই। এই ব্যবস্থা আমার চেতনার কারিকুরি এবং এই ব্যবস্থার নাম প্রাকৃতিক নিয়ম। প্রকৃতিতে বা বর্হিজগতে নিয়মের শৃঙ্খলা কেন? জগৎ নিয়মতন্ত্র রাজ্য কেন? কেন না, আমিই নিয়মের প্রতিষ্ঠাতা।

নিয়মের প্রতিষ্ঠায় আমার চেতনার বিকাশ ও জ্ঞানের প্রসার; সেই নিয়মের প্রতিষ্ঠাই আমার স্বভাব। যাহা নিয়মের ভিতরে এখনও আইসে নাই, তাহা আমার কেমন কেমন অসঙ্গত ঠেকে; তাহাকে দৈব বলি, অতিপ্রাকৃত বলি, মিরাকল বলি। তাহার জন্য ভূতপ্রেত - পিশাচের, দেবতা - উপদেবতার কল্পনা করি। তাহার জন্য আমাছাড়া জগৎছাড়া সৃষ্টিছাড়া একজন সৃষ্টিকর্তার ও বিধাতার কল্পনা করি।

যাহাতে এখনও নিয়ম দেখিতে পাইতেছি না, তাহাকে নিয়মের অধীনতায় আনিবার জন্যই আমার চেষ্টা। সর্বত্র যে আমি কৃতকার্য হইয়াছি তাহা নহে; তবে ইহার সফলতা ধরিয়া আমার আত্মবিকাশের পরিমাণ। ইহার নাম বিজ্ঞানচর্চা, —যাহার ফলে জ্ঞানের উন্নতি বা বিকাশ।’’

এইখানেই রামেন্দ্রসুন্দরের আধ্যাত্মিক সঙ্কট বা দ্বন্দ্বের মূল। ঊনবিংশ শতাব্দীর ঐতিহ্যে এবং পাশ্চাত্যের পূর্ববর্তী শতাব্দীর লব্ধ বিশ্বাসের ফলে জগতে নিয়মের একাধিপত্যে তাঁর স্বাভাবিক বিশ্বাস আছে। কার্যকারণবাদ ও ‘ল অফ ইউনিফর্মিটি অফ নেচার’ এই দুটি প্রধান নিয়মসূত্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারাকে শাসন করে এসেছে। ডারউইনের বিবর্তনবাদ তারই ফল। রামেন্দ্রসুন্দর সর্বত্রই এই নিয়মের প্রতিষ্ঠা আকাঙ্ক্ষা করেন, কার্যকারণ দিয়ে ব্যাখ্যা করতে চান , ‘ল অফ ইউনিফর্মিটি অফ নেচার’ দিয়ে আশ্বাস পেতে চান। কিন্তু সৃষ্টির কতকগুলি স্থল যেমন এই নিয়মসূত্র দিয়েও ঠিক বোঝানো যায় না। মানুষের সুখ দুঃখের পুরোপুরি সংজ্ঞা নির্ধারণ এই সূত্র দিয়ে করা চলে না। মঙ্গল - অমঙ্গলের সব ব্যাখ্যাও এতে চলে না। সৌন্দর্যের সংজ্ঞা নির্দেশও এর দ্বারা চলে না। এইজন্যই কখনও কখনও এই রকম সত্যের নির্বিশেষত্বে সন্দেহ এসে পড়ে। জগতে এমন ক্ষেত্র আছে, এমন সম্ভাবনা আছে যেখানে এসব নিয়মের আলো গিয়ে পড়ে না। কিন্তু সে জন্য, বলাই বাহুল্য, রামেন্দ্রসুন্দর কোনোরকম অলৌকিক বা মিস্‌টিক ব্যাখ্যার দিকে ঝুঁকতে একেবারেই অসম্মত। এই

সংশয় বা দ্বিধাই 'জিজ্ঞাসা'র মূল। রামেন্দ্রসুন্দরের 'নাস্তিক'ত্বের মূলও এখানেই।

প্রসঙ্গত আর একটি কথাও বলা দরকার। রামেন্দ্রসুন্দর নিয়মের কথা বলতে গিয়ে মাঝে মাঝেই একথা বলেছেন যে এ শেষ পর্যন্ত ব্যবহারিক সত্য মাত্র। উপরের উদ্ধৃতিতেই এর আভাস আছে। এই কথাটাই তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন অন্যত্র—[১৯]

''যাহাতে বিশ্বাস না করিলে জীবনযাত্রা চলে না বা নিজের অস্তিত্ব টিকে না, তাহাকেই আমরা সত্য বলি। কিন্তু এই শ্রেণীর সত্য আপেক্ষিক বা ব্যবহারিক সত্য। মানুষের যাবতীয় বিজ্ঞান এই ব্যবহারিক সত্য লইয়াই কারবার করে। জগদযন্ত্রের গতির পর্যালোচনা করিয়া এই সরল সত্যের আবিষ্কার করিতে হয়। অর্থাৎ ভূয়োদর্শন দ্বারা এই সকল সঙ্কীর্ণ প্রাকৃতিক সত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ভূয়োদর্শন যত বাড়ে এই সকল সত্যের মূর্তিও তেমনই পরিবর্তিত হয়। চিরকাল এক মূর্তি থাকে না। এই সকল সঙ্কীর্ণ অলৌকিক সত্যের মধ্যে আবার সবচেয়ে ব্যাপক সত্য প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা।''

সত্যের যে ব্যবহারিক এবং আপেক্ষিক রূপ আছে, এ-কথাটা প্রাচীন দর্শনে স্থান পেলেও এই ব্যবহারিক সত্যের উপর এতখানি আস্থা বা নির্ভর আর কোনো যুগে দেখা যায় নি। ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালি চিন্তায় সত্যের এই নতুন ধারণা অনেক বিপ্লব নিয়ে এসেছিল। ব্যবহারিক জীবন পূর্ণাঙ্গ ও সুন্দর করে তোলার দিকে যেমন আগ্রহ দেখা দিল তেমনি এর বৈজ্ঞানিক বুদ্ধি এবং বিচার আমাদের সমগ্র চিন্তাকে আকর্ষণ করে নিল। নির্বিশেষে সত্যের অনুসন্ধানই তাঁর ছিল প্রধান কাম্য। আধ্যাত্মিক ও ব্যবহারিক সত্যের দুই রূপকে আলাদা করে নেওয়াই আধুনিক যুগের চিন্তার লক্ষণ। আধুনিক মননরীতিকে বেকনের এটাই একটা বড়ো দান।—

He is concerned to insist that Truth is twofold. There is truth of religion and truth of science: and these different kinds of truth must be kept separate.[২০]

এতকাল এই দুই সত্যকে পৃথক করা হয় নি। ধর্মের সত্য বা শাস্ত্রের সত্য দিয়ে আধুনিক জীবনের জটিলতা এবং বৈচিত্রকে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। একথা উপলব্ধি না করা পর্যন্ত জীবনের অগ্রগতিও সম্ভব নয়। আধুনিক শিক্ষার উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিভিন্ন সত্যের সঙ্গে পরিচয় - সাধন করানো। প্রত্যক্ষ জগতের বিভিন্ন দিকের সত্যগুলিকে উদ্‌ঘাটন করাই আধুনিক মনন - বিদ্যার কাজ। আধুনিক কালে সমাজতত্ত্ব ইতিহাস ভূতত্ত্ব পদার্থতত্ত্ব জীববিদ্যা উদ্ভিদতত্ত্বমনস্তত্ত্ব শারীরতত্ত্ব প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্রের বহুবিধ সত্যকে আবিষ্কার সত্যের বৈচিত্র্যকে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। সত্যকে একটি মাত্র জেনে নিশ্চিন্ত হওয়া এখন অসম্ভব। যাই হোক, সত্য প্রত্যক্ষ জগতের এবং বহুবিধ— আধুনিক বাংলার মনন - ধারার এই উপলব্ধি নৈতিক বিচারে যে বিপ্লব উপস্থিত করেছিল বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় বিতর্কে সে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।[২১]

সত্যের বহুবিচিত্র রূপকে জানা জগতের বিন্যাস - কৌশল এবং শৃঙ্খলারীতিকে জানা, রামেন্দ্রসুন্দরের মতে এটাই হচ্ছে জ্ঞানের লক্ষণ। জীবপর্যায়ে উন্নত সেই, যে জ্ঞানী, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা তারই। জ্ঞানের মহিমায় রামেন্দ্রসুন্দর এমনই বিশ্বাসী ছিলেন যে তিনি হৃদয়ধর্মকে আলাদা কিছু বলে ভাবেন নি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর এখানে বোধহয় একটা বড়ো পার্থক্য। রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধির চর্চাকে অনেক সময় অনুভূতি - বিস্তারের বাধাই মনে করেছেন, [২২] রামেন্দ্রসুন্দর মনে করেছেন, যথার্থ জ্ঞানই হৃদয়ধর্মকে জাগ্রত করে। এ তাঁর যুক্তি অভিব্যক্তিবাদের উপরেই নির্ভরশীল। জীবপর্যায়ে যে যত উন্নত, সে তত বিশ্বজগতের অন্তঃস্থলে দৃষ্টি প্রেরণ করতে পারে, অনুভবশক্তি তার ততই বৃদ্ধি পায়। তিনি বলেন—[২৩]

''জ্ঞান ধর্ম, তাহারা ত অন্তর্দৃষ্টির প্রসার বাড়াইয়া অনুভূতির তীক্ষ্ণ জন্মাইয়া দুঃখভোগেরই সুবিধা করিয়া দেয়। যে জ্ঞানী, যে ধার্মিক, তাহার দুঃখভোগশক্তি অধিক; তাহার দুঃখও অধিক। মানুষেরই ত দুঃখ, কাঠপাথরের আবার দুঃখ কি?''

সুখ দুঃখের এই তত্ত্ব সেকালের সাহিত্যে একটা প্রধান ভাবনা ছিল। সুখ কি, দুঃখের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি— এ চিন্তা মনীষীদের মনে এসেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসগুলিতে মধুসূদনের মহাকাব্যে দুঃখবোধের ছায়া গভীর। অক্ষয়কুমার দত্তের চিন্তায় বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্মতত্ত্বে সুখ দুঃখের তত্ত্বপর্যালোচনা স্মরণীয়। থিয়োরির দিক দিয়ে সংজ্ঞা এই ছিল যে চিত্তবৃত্তির সামঞ্জস্যসাধনই মনুষ্যত্ব এবং মনুষ্যত্বই সুখ। বঙ্কিমচন্দ্র চন্দ্রশেখর উপন্যাসে রামানন্দস্বামী - চন্দ্রশেখরের কথোপকথনে সুখ দুঃখের দার্শনিক আলোচনা করেছেন।[২৪] সেখানেও রামানন্দস্বামী মনুষ্যত্ব - সাধনের উপদেশই দিয়েছেন। কিন্তু উপন্যাসে এটা হল নীতিনির্দেশ, দুঃখ পরিহারের উপায়। রামেন্দ্রসুন্দর নীতির দিক থেকে একে দেখেন নি, জ্ঞানের দিক থেকে দেখেছেন। দুঃখ জগতের মূল সত্য কেননা জ্ঞানের তৃপ্তি নেই, অনুভবশক্তির তৃপ্তি নই। কথাটা বোধহয় ঠিক। মানুষের বিচরণক্ষেত্র যত বিস্তীর্ণ আকাঙ্ক্ষা ততই সীমাহীন। ঊনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যের দঃখের সুর সর্বব্যাপী হয়ে ওঠার কারণও তাই। বাংলার আধুনিক চিত্তোন্মেষের সঙ্গে হৃদয়ধর্মের বিকাশও একই সঙ্গে হয়েছিল।

বাঙালির মননধারায় 'জিজ্ঞাসা'র আর একটি বড়ো দান আছে, আধুনিক মননপদ্ধতির সঙ্গে বৈদান্তিক মনন - পদ্ধতির সমন্বয়সাধন। ইতিপূর্বে এ চেষ্টা হয় নি। রামমোহনের সময় থেকে বেদান্তের প্রসঙ্গ বারবার উত্থাপিত হয়েছে। রামমোহনের অদ্বৈতবাদের আভাস কিছু কিছু পাওয়া গেলেও সে ছিল তাঁর অধ্যাত্মচিন্তার অঙ্গ। অদ্বৈতবাদী চিন্তা যে মানুষকে নিরুদ্যম করে লোককল্যাণে উদাসীন করে রামমোহন স্পষ্টত সে - কথা না বললেও আমহার্স্টের কাছে লেখা চিঠিতে তার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। এই বিষয়টাই খ্রীষ্টান মিশনারীদের একটি প্রধান বক্তব্য হয়ে দাঁড়িয়েছিল।[২৫] দেবেন্দ্রনাথও অদ্বৈতবাদকে স্বীকার করেন নি। তিনি ছিলেন ভক্ত উপাসক। অধ্যাত্মসাধনার পক্ষে প্রয়োজন ছিল দ্বৈতবাদকেই অবলম্বন করা। কেশবচন্দ্রও ছিলেন ভক্ত সাধক। এঁরা সকলেই ছিলেন সংস্কারক, ইহজীবনকে তাঁরা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে নিস্পৃহচিত্তে দেখেন নি। অক্ষয়কুমার বঙ্কিমচন্দ্র ভূদেব ছিলেন তাত্ত্বিক। অক্ষয়কুমার বঙ্গিমচন্দ্র দুজনেই পাশ্চাত্য মনীষীদের দ্বারাই পরিপূর্ণভাবে প্রভাবিত। ভূদেবের মনীষাও ছিল আধুনিক যুক্তিবাদে প্রতিষ্ঠিত যদিও বেদান্তের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল স্পষ্ট। ভূদেবের 'সামাজিক প্রবন্ধ' সমাজ ও ব্যক্তির ব্যবহারিক সম্পর্ক নিয়ে ইতিহাস এবং সমাজতত্ত্বের ভিত্তিতে নৈতিক বিচার। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর কতকগুলি দার্শনিক প্রবন্ধ রচনা করেছেন বেদান্তের আলোচনা করে।[২৬] বস্তুত ব্রাহ্ম - সমাজের উপনিষদ চর্চার ফল হিসাবে এই সম্প্রদায়ভুক্ত কয়েকজন বেদান্তের সম্বন্ধে দার্শনিক আলোচনা[২৭] করেছিলেন সত্য, কিন্তু যে - অর্থে রামেন্দ্রসুন্দর আধুনিক এবং সজীব মননরীতির সঙ্গে বৈদান্তিক সিদ্ধান্তের সমন্বয় করেছিলেন, সে - অর্থে এঁরা বেদান্তের আলোচনা করেন নি। এঁদের আলোচনা পুঁথিগত এবং শাস্ত্রানুগ। বিশেষত দ্বিজেন্দ্রনাথও ছিলেন ভক্তিবাদী। বস্তুত অদ্বৈতবাদের সঙ্গে লোকশ্রেয়কে মিলিয়েছিলেন যথার্থভাবে একজনই। তিনি স্বামী বিবেকানন্দ, কিন্তু রামেন্দ্রসুন্দরের মতো শুধুই জ্ঞানী এবং প্রেমিক। তাঁর বস্তুজিজ্ঞাসা ছিল বহু কল্যাণকামনারই ফল।

রামেন্দ্রসুন্দর ছিলেন বিশুদ্ধ জ্ঞানসাধক। জীবন জগৎ সমাজ সম্বন্ধে তাঁর কোনো নৈতিক আদর্শ প্রচার নেই। তিনি বস্তুজগৎকে বিশ্লেষণ করেছেন, নিয়ম বের করবার চেষ্টা করেছেন। বারবার বলেছেন, এ নিয়ম - রচনা নেহাতই ব্যবহারিক অর্থাৎ একটা নিয়মে অভ্যস্ত না হলে জীবনরক্ষা হয় না সেইজন্যই নিয়ম মানতেই হয়। এই ব্যবহারিক (Pragmatic) জ্ঞানময় চিৎ সত্তা। এর কাজই জগৎকে সত্যটিকে যে বের করে সে 'আমি' অর্থাৎ জ্ঞানময় চিৎ সত্তা। এর কাজই জগৎকে সুবিন্যস্ত সুশৃঙ্খল করে দেখা। রামেন্দ্রসুন্দর এই আত্মার

নিয়ম - রচনার আনন্দকেই অন্যনিরপেক্ষ মূল্য দিয়েছেন, যদিও এই নিয়মের কোনো নির্বিশেষ (absolute) মূল্য নেই। কেননা প্রতি মুহূর্তেই নিয়মের পরিবর্তিত হওয়ার সম্ভাবনা। যার সম্বন্ধে শেষ পর্যন্ত সংশয় করা যায় না, সে হচ্ছে এই আত্মা বা জ্ঞানময় সত্তা জগৎ আপেক্ষিক, জগতের নিয়ম আপেক্ষিক— এই সিদ্ধান্ত করতে রামেন্দ্রসুন্দরকে দার্শনিক উপমা বা যুক্তির আশ্রয় নিতে হয় নি, বিজ্ঞানের সিদ্ধান্ত দিয়েই তিনি সপ্রমাণ করেছেন। জগৎকে আপেক্ষিক বললেও জগতের বিশ্লেষণ করতেই যার আনন্দ সেই জ্ঞানময় সত্তাকে তিনি আপেক্ষিক বলতে পারেন নি।

'জগতে যতগুলা সত্য মানিতে হয়, তার মধ্যে একটা সত্য সকলের উপর সত্য। আর সকলই তার নীচে। আমি আছি, ইহা অপেক্ষা সত্য কথা আর দ্বিতীয় নাই। যাবতীয় বিজ্ঞানের প্রথম স্বতঃসিদ্ধ এই। জীবনযাত্রার আরম্ভ এই সত্য - বিশ্বাসে। যদি কোন সত্যকে নিরপেক্ষ ধ্রুব সত্য বলিতে হয়, তাহা এই সত্য। বস্তুতঃই ইহা পারমার্থিক সত্য।"[২৮]

ডেকার্ট এই যুক্তি দিয়েই পাশ্চাত্যে র‍্যাশনালিজমের সূত্রপাত করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দরের চিন্তায় বেদান্তের অদ্বৈতবাদের সঙ্গে ডেকার্টের যুক্তি সমন্বিত। তাঁর 'বিচিত্র জগতের' মননধারার পূর্বাভাস ছিল এখানেই।

১। 'সুখ না দুঃখ', ১২৯৯

২। 'জগতের অস্তিত্ব' ১৩০০

৩। 'বিজ্ঞানে পুতুলপূজা' ১৩১৭

৪। অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' প্রথমভাগ, ১৭৭৩ শক, উপক্রমণিকা।

৫। The study of Hindu philosophy, 1873.

৬। The impetus to enquiry and the promotion of thought given by Derozio manifested itself in debating clubs which were encouraged by Hare. They sprang up in every part of the town. Hare seeing the tendency of the Hindu mind, arranged with Derozio to deliver a course of lectures of metaphysics at his school which was open to the public. Some four hundred youngmen were used to attened the lectures, which were continued for sometime. - Peary Chand Mitra, Biographical Sketch of David Hare, 1877 P.33.

৭। আত্মচরিত, ২ সং পৃ ২৩

৮। মেঘনাদবধ কাব্য, নবমসর্গ, ৩৯৯৪০০

৯। মেঘনাদবধ কাব্য, প্রথমসর্গ ৭৪০-৭৪২

১০। Basil Willey The Seventeenth Century Background, 1962. p11.

১১। ধর্মতত্ত্ব, প্রথম অধ্যায়

১২। ধর্মতত্ত্ব, একাদশ অধ্যায়

১৩। Will Durant, The Story of Philosophy, Chapter III. The Adavancement of Learning.

১৪। পূর্বোক্ত গ্রন্থ ও অধ্যায়

১৫। দ্রষ্টব্য অক্ষয়কুমার দত্ত, 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানবপ্রকৃতির সম্বন্ধবিচার' ১ম ভাগ, 'প্রাকৃতিক নিয়ম' অধ্যায়।

১৬। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদেশের কৃষক', 'কৃষ্ণচরিত্র' - প্রবন্ধ প্রভৃতি ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'সামাজিক প্রবন্ধ' দ্রষ্টব্য।

১৭। 'নিয়মের রাজত্ব ১৩০৬

১৮। 'সৃষ্টি', ১৩০০

১৯। 'সৃষ্টি'১৩০০

২০। Basil Willey : The Seventeenth Century Background, Chapter 2. Twofold Truth.

২১। এই প্রসঙ্গের বিস্তৃত আলোচনার জন্য বর্তমান লেখকের 'চিন্তানায়ক বঙ্কিমচন্দ্র' ১৯৬১, ১৩২ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

২২। দ্রষ্টব্য রবীন্দ্রনাথের পঞ্চভূত, 'মন', অখণ্ডতা প্রভৃতি রচনা।

২৩। 'সুখ না দুঃখ' ১২৯৯

২৪। চন্দ্রশেখর ৩ খণ্ড ১ পরিচ্ছেদ।

২৫। দ্রষ্টব্য Alexander Duff, India and India Mission 1840.

২৬। অদ্বৈতমতের সমালোচনা, ১৮৯৬ অদ্বৈতমতের প্রথম ও দ্বিতীয় সমালোচনা, ১৯৮৭ 'সার সত্যের আলোচনা', ১৯০১।

২৭। বিশেষত 'ভারতী' পত্রিকায় এ শ্রেণীর দার্শনিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হত।

২৮। 'সত্য' ১৩০০